কোজাগরী

শকুন্তলা খাঁ ভাদুড়ী

লক্ষ্মী পূজা, সঠিক উচ্চারণে "লক্ষ্মী পূজা", বা আমাদের বাঙালীদের সাধের "লোক্খি পুজো"। করা বেশ সহজ, নিয়মের কড়াকড়ি কম, আর অনুষ্ঠানের দেখভালের জন্য পুরুতের খুব একটা প্রয়োজন নেই। এই বছর তাই লক্ষ্মী পুজোই ঠিক হল। আমার প্রথম "স্বাধীন" পুজো, বাড়ি থেকে দূরে। আর পতিদেব অনেক দিন ধরেই ছোঁকছোঁক করছিলেন লুচি, বেগুনভাজা, পায়েসের জন্যে, তাই নিজেই বেশ উৎসাহভরে "পুজোর বাজার" করে আনলেন মায়ামি-র উত্তর থেকে, পঞ্চাশ কিলোমিটার ড্রাইভ করে।

ইতস্ততঃ এক পা, দুই পা করে পরিকল্পনা এগিয়ে চলল বাস্তবায়নের দিকে। কিভাবে শুরু করব? কি কি লাগবে? ধর্মেকর্মে আমার খুব একটা মতি কোনদিনই ছিলনা, তাই শশব্যস্তে ফোন করলাম মা আর মামী কে, তাঁরা তো আহ্লাদে আটখানা। কথোপকথন চলল –

"এই তো, কিছু না, খুউব সোজা। এইটা এইটা লাগবে..." (এক ডজন জিনিসপত্রের ফর্দ, আর তার সঙ্গে না পাওয়া গেলে বিকল্প ব্যবস্থার পরামর্শ)

"পঞ্চশস্য আছে? না না, পাঁচফোড়ন দিয়ে হবে না, শুধু চাল দিয়ে দিস। ডাব না পেলে যে কোন গোটা ফল ঘটে বসিয়ে দিস।"

"লাল গামছা নেই? একটা রুমাল দিয়ে ঘট ঢেকে দিবি... নতুন রুমাল আছে তো? পেপার ন্যাপকিন হলে... নাঃ, পেপার ন্যাপকিন-এ হবে না।"

"বেলপাতা-তুলসীপাতা পাওয়া যাচ্ছে না? মা লক্ষ্মী তো সবই জানেন, বলে দিস এখানে ওসব পাওয়া যায় না... না, রান্নার মশলা শুকনো তুলসীপাতা দেবার দরকার নেই।"

প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।

ফর্দ লিখে নিয়ে শুরু হল কাছে দূরে যাবতীয় ইন্ডিয়ান গ্রোসারী স্টোর-এর তত্ত্বতল্লাস। চন্দন – লাল আর সাদা – পাওয়া গেল। ছোট বোতলে গঙ্গাজল – তাও পাওয়া গেল। ("ওটা হরিদ্বার-ব্র্যান্ডের কলের জল" – পতিদেবের ফোড়ন) তামার ঘট, প্রদীপ, সলতে, নতুন কাপড়, নারকোল ("ছোলার ডাল হবে বুঝি?"), পান, সুপুরী, কর্পূর – পাওয়া গেল। পাঁচ রকমের ফল, পাঁচ রকমের তরকারী, ময়দা, সুজি, মিষ্টি – সবই মিলে গেল। জিঙ্ক অক্সাইড পেলাম না। তাহলে আলপনার জন্য পোস্টার কালার-ই সই।

আবার মা-কে ফোন, এবার জিজ্ঞাস্য পুজোর প্রণালী আর ভোগ-নৈবেদ্যর খুঁটিনাটি। কিঞ্চিত অদ্ভুত আলোচনা হল এইরকম –

মা – পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর, ধূপ, জলশঙ্খ, ফুল, পাখা এই সব দিয়ে আরতি করবি।

আমি – জলশঙ্খ নেই। পাখা নেই। এমনি শাঁখে একটু জল দিয়ে আরতি করে দেব, আর কাগজ দিয়ে পাখা বানিয়ে দেব, হ্যাঁ?

মা – ঠিক আছে। পাঁচালী আছে তো?

আমি – চিঙ্কি বলেছে আইপ্যাড-এ ডাউনলোড করে দেবে।

মা – ঠিক আছে, নিবেদন করে নিস।

আমি – আইপ্যাড-টা নিবেদন করে দেব?

মা – না না, ওই ভোগ ফল প্রসাদ এই সবে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিবেদন করে দিস।

আমি – আচ্ছা, ঘটে কি যেন একটা আঁকতে হয়?

মা – হ্যাঁ, কাঠি কাঠি হাত পা-ওলা মানুষ – প্রথমে একটা প্লাস আঁক, তারপর ওপরে একটা গোলমত মুখ, হাত পা গুলো এক্সটেন্ড করে ল্যাটারালি...

আমি – ল্যাটারাল আবার কি? বাইরের দিকে করব তো?

মা – ল্যাটারাল মিডিয়াল বুঝিস না? মিডিয়াল মানে শরীরের মধ্যাংশের দিকে, ল্যাটারাল মানে...

আমি – না ওসব ডাক্তারী ব্যাপার – পুজোর মধ্যে ল্যাটারাল-মিডিয়াল হিজিবিজি... ধুত্তেরি। হাত পা গুলো টেনে টেনে বাইরের দিকে বার করে দেব, এই তো?

মা – হ্যাঁ, আর প্রোপোর্শন-গুলো ঠিক রাখিস, মানে গলা পেট হাত পা...

আমি – ওফফ মা! আচ্ছা আমি রাখছি এখন।

পুজোর দিন সকাল। ঘটের জন্য মালা, যাতে শুকিয়ে না যায় তাই গেঁথে গুছিয়ে ফ্রীজ-এ রাখা। নৈবেদ্যর জন্যে গোবিন্দভোগ চাল ভিজনো। পায়েস তৈরী। ভোগ-এর সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা চিঙ্কি রাঁধবে বলে, সে সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছোচ্ছে। মনে মনে একটু গজগজ করলাম নাড়ু, মুড়কি আর দই-এর অভাবের জন্য। এইসব উত্তেজনার মধ্যে প্রায় ভুলেই গেছিলাম যে আপিস-কাছারী, মিটিং ইত্যাদি জাগতিক ব্যাপারস্যাপারও আছে, নজর দেবার জন্য। কিন্তু কাজ মোটামুটি সাবাড় হয়ে গেল দুপুরের মধ্যে – খুব সম্ভবত দৈবী হস্তক্ষেপে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুপুরবেলা। বাড়ির আশেপাশে চক্কর কাটতে গেলাম, যদি একটা সার্বজনীন আমগাছ পাওয়া যায়। এখানে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির সামনের জমিতেই বিভিন্ন আমগাছ আছে, কিন্তু আমি খুঁজছি এমন একটা (১) যার কয়েকটা ডালপালা আছে হাতের কাছে (২) যেটা একটু লোকচক্ষুর অন্তরালে। Et voilà! বাড়ি ফিরলাম মহার্ঘ সপ্তপর্ণী আমের ডাল নিয়ে; কিছু কলাপাতা, জুঁই আর জবাও পাওয়া গেল আশপাশের অচেনা প্রতিবেশীর বাগানে। বেশ একটা বারোয়ারি-বারোয়ারি ব্যাপার – আমি প্রসন্নচিত্তে বাড়ি পৌঁছালাম।

সন্ধ্যেবেলা। বসবার ঘরের আসবাব পত্র ঠেলে ঠুলে পুজোর জায়গা হলো। ছোট্ট রুপোর "লক্ষ্মী ঠাকুর"-এর মূর্তি তেপায়া টেবিল-এর ওপরে সাজানো, জবা আর জুই দিয়ে। সামনে প্রদীপ আর ধুপকাঠি জ্বালানোর জন্য তৈরী। ছোট্ট ছোট্ট কলাপাতার টুকরোর ওপরে সমস্ত উপচার – পঞ্চপ্রদীপ, শাঁখ, চন্দন, সিঁদুর, একটা ছোট লালপাথরের বোতলে গঙ্গাজল, কর্পূর, আর ঘট। পোস্টার কালার দিয়ে একটু আলপনা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু খুব একটা দাঁড়াল না দেখে নতুন জোগাড় করা হামানদিস্তায় একটু চাল বাটলাম, অল্প জল দিয়ে লেই বানিয়ে তাই দিয়ে আবার আলপনা আঁকা হল – এবার অনেক সুন্দর হল। নিজেই বাঃ বলে নিলাম একটু।

পতিদেব চিঙ্কি-কে নিয়ে এলেন এয়ারপোর্ট থেকে। বসার ঘরের আমূল পরিবর্তন আর একটা "পুজো পুজো গন্ধ" – তাতে আমি চমৎকৃত, বেশ গদগদ হয়ে পড়লাম। রান্না, কাটাকুটি, ভাজাভুজি শেষে চিঙ্কি আর আমি শাড়ি পড়ে নিলাম, পুজো শুরু হল রাত্রি এগারোটা নাগাদ। বার্মুডার ওপরে একটা পাঞ্জাবী চাপিয়ে আর ভোগের থালায় হাত মেরে পতিদেব আয়োজনে যোগদান করলেন। "মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি"র কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছিল।

পূর্ণিমা। আসনে বসে আমাদের বাড়ির আসল পুরুত ঠাকরুণ – মামী – কে অনুকরণ করার চেষ্টা করছি; সমস্ত নৈবেদ্যতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে যা যা মন্ত্র মনে ছিল পড়ে গেলাম একধারে, দুর্গা, শিব, নারায়ণ, কালী, চন্ডী, সরস্বতী আর অবশ্যই, লক্ষ্মী – সবাইকেই ডেকে ফেললাম। ভাবলাম সবাই যখন সেই একই সুখী পরিবারের সদস্য, তখন মা লক্ষ্মী নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না অন্যান্য দেব-দেবীর সঙ্গে তাঁর পুজো ভাগ করে নিতে। এর পরে তাম্রনির্মিত ঘটের গায়ে সুন্দর কাঠি-চিত্র, ওপরে আমপাতা, নারকোল আর লাল কাপড়, তাতে চাপান প্রায়-জমে বরফ মালা। এবার আইপ্যাড-মারফত পাঁচালী পঠন, আশাতিরিক্ত সুষ্ঠভাবেই হয়ে গেল। সবশেষে বিনা-পাখাতেই আরতি, পুষ্পাঞ্জলি – ব্যাস্, পুজো শেষ।

মাথাটা অদ্ভুতরকম হাল্কা লাগছিল, মনে পড়ল সারাদিন দাঁতে কিছু কাটা হয়নি। সেরকমই হওয়া উচিত অবশ্য।

এবার খাওয়ার পালা, তার সঙ্গে প্রসাদ আর ভোগ সেবন। চাঁদ ততক্ষণে আদ্ধেক আকাশ পার করে ফেলেছে। প্রারব্ধ কর্মের সুচারু সমাধানে যুগপৎ উল্লসিত এবং অবসন্ন আমরা এবার শয্যাভিমুখে, যদিও তার আগে চকিতে ফেস্‌বুক-এ ছবি আপলোড হয়ে গেল, আর মা-কে ফোন-এ রিপোর্ট করে দিলাম আমার প্রথম পুজোর সাফল্যের বার্তা।

বহুপরে, এক নিঃশব্দ চিন্তনের মূহুর্তে, একটা চিন্তা – যেটা দানা বাঁধছিল অনেকক্ষণ ধরে – আত্মপ্রকাশ করল স্বমূর্তিতে। বুঝতে পারলাম, আমি এই পুজোটা ধর্মীয় আতিশয্যে করিনি, অথবা মা লক্ষ্মীর কৃপালাভের আর্তচিন্তায়ও নয়। (ঘটনা হল, কোন অনির্দিষ্ট কারণে আমি বরাবরই মা সরস্বতীকে অনেক বেশী কাছের বলে মনে করেছি।)

তো কেন করলাম? এক্কেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ এবং স্বার্থের কারণে – আমার ছোট মায়ামি-র বাড়িকে ওই পি৫৪৪, রাজা বসন্ত রায় রোড-এর একটা অংশে পরিণত করতে। ছোটবেলার স্মৃতিগুলোর সঙ্গে আবার সংযোগস্থাপন করতে, চন্দনকাঠ, ধুপ আর হোম-এর আগুনের চিরপরিচিত রূপকে ফিরে পেতে। মন্ত্রপাঠের অচঞ্চল স্বর, শঙ্খধ্বনির সুরেলা আওয়াজ; তেলের প্রদীপের স্তিমিত আলো; সবুজ পাতার ওপরে রঙীন ফুলের অসাধারণ নকশা; ঘি-কর্পূর-চন্দন-অগুরুর সুবাস। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে একাত্মবোধের বাসনাপূরণ। এবং আবার করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অবর্ণনীয় অনুভূতি।

এবং আমাদের “তিনতলার ঠাকুরঘর” সাতসমুদ্র পার করে এসে তার আলিঙ্গনে আমাদের ঘিরে ধরল। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং।

আমরা সেই আশীর্বাদধন্য।